ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ: কবিতায় শৈল্পিক উচ্চারণ

*ড. ফজলুল হক সৈকত

সারসংক্ষেপ: ভাষা-আন্দোলন, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তার পূর্বাপর ঘটনারাজি এবং অর্জনের আনন্দ বাংলা সাহিত্যের জন্য এক অনবদ্য প্রেরণা। জাতির জন্ম ও বিকাশের এই ইতিহাস ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের কবিরা ধারণ করেছেন। তাঁদের চিন্তা ও প্রকাশ-কৌশলে আমরা বারবার সে বিষয়টি লক্ষ করেছি। দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন ও বাস্তবতা শেষ পর্যন্ত একটি জাতিকে কীভাবে সাফল্যের সীমানায় পৌঁছে দিতে পারে, তার প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত ও শিল্পিত প্রকাশ পাওয়া যায় বাংলাদেশের কবিতায়। এছাড়া আরো মেলে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তি পাওয়া-না-পাওয়ার ইতিবৃত্ত। মূলত এই দুটি বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বাংলা কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তার স্বরূপ-অন্বেষা বর্তমান গবেষণার প্রধান পরিপ্রেক্ষিত। বিষয়ের পাশাপাশি কাব্য-প্রকাশশৈলী এবং কথা-ভাবনা নির্মাণের শোভার বর্ণিলতা এখানে পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে মনোযোগ স্থাপিত হয়েছে কবিতার শৈল্পিক উচ্চারণের প্রতি।

প্রাক-কথন

প্রতিবাদ-প্রবণতা বাঙালির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ ভারতে এবং পাকিস্তান শাসনামলে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ঘটনায় বাঙালির প্রতিবাদ-বিদ্রোহের প্রমাণ মেলে। অন্যায়ের সাথে আপসকামিতা নয়, বরং আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছে বাঙালি প্রায় সকল প্রতিকূল পরিবেশে। রাষ্ট্রীয় অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কবিতা রচনার জন্য অগ্রগণ্য নাম বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। প্রতিকূল পরিবেশ আর পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য তিনি নাটকীয় পরিবর্তন প্রত্যাশা করেছিলেন। বাঙালি কবি প্রতিবাদী নজরুলের এক চমকপ্রদ কথা– 'আমি মানি না কো কোন আইন'[১]। বাঙালির এই বিদ্রোহ-মুখর চেতনাকে এবং সদা-জাগ্রত সত্তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে অন্য এক সমাজলগ্ন কবি অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন এভাবে–

বেয়নেট হোক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিয়ো, বন্ধু!
শেল আর বম হোক ভারালো
কাস্তেটা শান দিয়ো, বন্ধু।...

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই! চেয়ে দ্যাখো বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছো কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা, বন্ধু![২]

১৯৫২ আর ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল দুটি সময়। এই দুটি বছর কেবল ক্যালেন্ডারে আঁকা সংখ্যা নয়– সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাঁক-বদলের কাল। বাঙালির চিন্তা ও পরিকল্পনায় যে প্রত্যাশার আলো বারবার উঁকি দিয়ে

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

ফিরছিল, তার রূপায়ণের প্রহর বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৭-এর দেশবিভাগ এবং ১৯৫২'র ভাষা-আন্দোলনের পথ পাড়ি দিয়ে এই ভূখণ্ডের মানুষ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রভূমি প্রতিষ্ঠার উষালগ্নে উপস্থিত হয়। এরপর ১৯৭১ সালে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা। ঠিকানা বদলের এবং বিশেষভাবে একটি জাতির স্থায়ী ঠিকানা সৃষ্টির বর্ণিল শোভা বাংলা কবিতাকে করেছে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ ও বিবর্তনের সূত্রগুলোর প্রতি কবিদের প্রখর দৃষ্টি, প্রবল সচেতনতা আর প্রকাশের নবতর কৌশল বাংলা সাহিত্যে নির্মাণ করেছে এক বিশেষ ভুবন। মানুষের অধিকার, মর্যাদা আর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামগুলো আধুনিক বাংলা কবিতার উপাদান হয়েছে, হয়েছে শক্তি ও প্রেরণা। 'আধুনিক প্রবণতা ঠিক সমাজ জীবনের কোনো ফটোগ্রাফিক উপস্থাপনা নয়, কেবল বর্ণনা নয়। সংবাদপত্রের ভাষা ব্যবহারের বদলে গদ্যভাষার মাধ্যমে প্রতিবেদন রচনা নয়। বরং রাজনৈতিক সচেতনতা তার ভেতর অনেক উজ্জ্বল, বেশি তীব্র।'[৩]

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির এক বিরাট অহংকারের নাম। মাতৃভাষার মর্যাদা আর মানুষের অধিকার আদায়ের যে লড়াই বাঙালি করেছে, সেই সংগ্রামের স্বীকৃতি এই একুশ। এই আন্দোলনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস আছে। আছে প্রাতিস্বিকতা রক্ষার ঐতিহ্য। ভাষা থেকে ভূখণ্ড– এই হলো একুশে ফেব্রুয়ারির মূল প্রত্যয় ও প্রাপ্তির জায়গা। একুশের চেতনাই কালের পরিক্রমায় বাঙালিকে স্বাধিকার চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাও এক অর্থে এই একুশ। আর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় তো আমাদের জাতীয়তাবাদী ধারণার এক সুদৃঢ় স্তম্ভ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বাঙালির চেতনায় যে প্রবল আঘাত হেনেছে, তার বিষবাষ্প ছড়াতে ছড়াতে এই মাটিতে মানুষে মানুষে যে হিংসা-প্রতিহিংসা-প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল, দানা বেঁধেছিল শত্রু-শত্রু খেলা, তারই সমন্বিত ও শেষ সফল প্রতিবাদের ভিত নির্মিত হয়েছিল ১৯৭১ সালে লক্ষ-কোটি মানুষের তৈরি করা সহযোগিতার শক্ত বন্ধনের মধ্য দিয়ে। এই দীর্ঘ পথযাত্রার বেদনা ও আনন্দের কথা, সমূহ দাগ-যন্ত্রণা আর বিজয়গাঁথা, এর ভেতরের রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি, এর শরীরে লেগে থাকা ধর্ম ও চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আলো এবং ছায়া ফেলেছে বিপুলভাবে। ২১ আর ৭১-এর শেকড় থেকে বৃক্ষ ও ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালির সাহিত্য-সাধনার উঠানে। সমকাল তার সতর্ক সাক্ষী। কিন্তু ভাষা-আন্দোলন আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কতোটা লালন করে উত্তর-প্রজন্ম? প্রাসঙ্গিক বিষয় জানার এবং বুঝার জন্য কতটুকু পরিসর আমরা প্রসারিত রাখতে পেরেছি বর্তমান প্রজন্মের জন্যে? এইসব প্রশ্নের উত্তর আজও আমরা খুঁজে ফিরি। বিশেষ করে এই সময়-পরিসর বাংলা সাহিত্যের জন্য একটা বিবর্তনের কাল। কেননা, 'সাতচল্লিশ-একান্নো পর্বের পাকিস্তানবাদী কবিতাকে প্রত্যাখান করে বিকশিত হয় বাঙলাদেশের কবিতা; আর ওই জীবন ও সমাজব্যবস্থাকে অস্বীকার ও বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকার করে এগোয় আমাদের জীবন ও সমাজ; এবং পাকিস্তানকে পুরোপুরি বর্জন করে উদ্ভূত হয় বাংলাদেশ।[৪]

একুশের চেতনা আর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা বিষয়ে সাধারণভাবে একটা প্রচলিত বিশ্বাস বা ধারণা থাকলেও এর ভেতরে আমরা খুব বেশি প্রবেশ করতে পারিনি। আর

এমনটা হয়েছে ইতিহাস পাঠের প্রতি একধরনের অনীহা কিংবা অনাগ্রহ থেকে। আমরা হয়তো জানি, ভবিষ্যতের পথ নির্মাণ করার জন্য ইতিহাসকে পাঠ করতে হয়। এর কোনো ভালো বিকল্পও নেই। রাষ্ট্র, তার সমাজদর্শন, তার ব্যাপ্তি এসব বিষয়ে যে জাতি যতো বেশি আগ্রহী, তার অগ্রগমন ততো সহজ হয়ে ওঠে। 'বাংলাদেশ' নামক যে স্বাধীন রাষ্ট্রভূমি আমাদের বিচরণক্ষেত্র, তার সৃষ্টির পথ ও পরিক্রমা যে অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তা ছড়িয়ে দিতে হবে– এটা তো সরল কথা। কিন্তু এই কাজটি করা যায় কীভাবে? পঠন-পাঠন হতে পারে জাতীয় চেতনা ধারণ ও বিস্তারের একটি উত্তম মাধ্যম। ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের কবিতা বিষয়ক পাঠচিন্তন-প্রক্রিয়াও সামান্য সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে।

হাজার বছরের ইতিহাসে এই ভূখণ্ডের মানুষ ২০০ বছরেরও বেশি সময় পরাধীনতা আর বঞ্চনার যন্ত্রণা যাপন করেছে। পূর্ব-বাংলা তথা বাংলাদেশের জনগণ ব্রিটিশ ভারতে ছিল পরাধীন আর পাকিস্তান পিরিয়ডে ছিল বিপুল বৈষম্যের শিকার। আমাদের কবিরা সেই পরাধীনতা আর বৈষম্যের কাহিনি, ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বপ্ন, কল্পনা আর পরিকল্পনার নানান ছবি ও কথা সাজিয়েছেন তাঁদের কবিতায়।

ভাষা-আন্দোলন: কবিতায় শৈল্পিক উচ্চারণ

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জন্য এক অপার সম্ভাবনার দিন। আর কেবল বাঙালির জন্য নয়, পৃথিবীর সকল জাগ্রত মানুষের কাছে ভাষা-সংগ্রাম একটি বিস্ময়কর ঘটনা; সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিজয়ের মাইলফলক। পূর্ব-বাংলার মানুষ তখন পাকিস্তান সরকারের একরোখা চিন্তা ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। আর তাদের তখনকার দাবি ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার ও যৌক্তিক। 'পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতি যাতে সমানভাবে রাষ্ট্রের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, যাতে প্রত্যেক জাতি শিক্ষা ও কৃষ্টিতে বিকাশ লাভ করতে পারে, তার জন্য সকল ভাষাকে সমান মর্যাদা দিতেই হবে। প্রত্যেকটি জাতির ভাষার অধিকার তার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্যতম মূল কথা।'[৫] ভাষা-আন্দোলন না হলে এই অঞ্চলবাসীর পক্ষে স্বাধীনতার বা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নতার জন্য এত তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়তো দেখা দিত না। তবে ভাষা-আন্দোলনই তাতে অনুপ্রেরণা দান করলেও সেটাই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র কারণ নয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বপ্রধান কারণ হলো– পশ্চিম পাকিস্তানি রাষ্ট্রনায়কদের দ্বারা এই অঞ্চলের মানুষের ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য উদগ্র বাসনা, যা পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা মেনে নিতে পারেনি। চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়– একটি ধারণাতে নানান বিষয় যুক্ত হয়ে তা পরিশেষে মতবাদে পরিণত হয়, তেমনি যে কোনো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিচিত্র বিষয়ের কার্যকারিতার ফলে তা একটি বিরাট আন্দোলনে পরিণত হয়। 'প্রথম সামরিক শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত রচিত কবিতায় বিশেষ কোনো বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি; সেগুলোতে পাওয়া যায় একটা অনির্দেশ সম্ভাবনার কথা এবং একটা বেদনা করুণ ব্যঞ্জনা।... সামরিক শাসন জারি হলে (১৯৫৮) প্রদেশে প্রতিক্রিয়াশীলতার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং নানাভাবে চেষ্টা চলে আন্দোলনের লক্ষ্যকে বানচাল ও বিপথগামী করার। এই নৈরাজ্যজনক অবস্থা ছায়া ফেলেছে ওই সময়ের কবিতায়।

তৎকালের ভাষা-আন্দোলন বিষয়ক কবিতায় লক্ষ্য করা যায় অসহায়তা ও আশাভঙ্গের চিত্র, কিন্তু সেগুলোতেও বলা হয়েছে একুশের অপরাজেয় ঐতিহ্যের কথা। তারপর থেকে এই ভাব ক্রমশ কেটে গিয়ে শেষ পর্যায়ে কবিতায় প্রধান হতে থাকে প্রতিবাদী বক্তব্য, সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে।'[৬] তবে সার্বিকভাবে কবিতা-প্রবাহে ভাষা-আন্দোলন একটা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। 'ভাষা-আন্দোলন আমাদের সামূহিক কবি-চৈতন্যে নিয়ে আসে নতুন মাত্রা; ভাষা-আন্দোলন হয়ে ওঠে বাংলাদেশের কবিদের অবিনাশী শিল্প-আয়োজন। যখনি শৃঙ্খলমুক্তির প্রয়োজন আসে, যখনি প্রয়োজন শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারণ কিংবা জনস্রোতের জোয়ার– ভাষা-আন্দোলন আর তার শহিদেরা তখনি দ্রোহের ভূমিকায় হয় অবতীর্ণ। ওই অবিনাশী শক্তি-উৎস তাই বায়ান্ন-উত্তর বাংলাদেশের কবিতার এক প্রধান অনুষঙ্গ।'[৭]

'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতাটি ভাষা আন্দোলন নিয়ে লিখিত প্রথম কবিতা। এই জন্য কবিতাটিকে একুশের প্রথম কবিতাও বলা হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কবিতাটি রচনা করেন ভাষাসৈনিক মাহবুব উল আলম চৌধুরী (১৯২৭-২০০৭)। এই কবিতায় বাংলা ভাষার ঐতিহ্য, বাঙালির সাংস্কৃতিক শক্তির মর্যাদা তুলে ধরে এর ওপর আঘাতকারীদের প্রতি ঘৃণা নিক্ষেপ করা হয়েছে। কবিতাটির ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য অসীম–

যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছে
তাদের জন্য আমি ফাঁসি দাবি করছি।
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের জন্য
ফাঁসি দাবী করছি।[৮]

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) বামপন্থী চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। বামপন্থী রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনে এবং প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলনে তাঁর সাহসী ভূমিকা আজ অনেকেই ভুলে গেছেন; কিন্তু পথে-মাঠে-ময়দানে ও শিল্পকর্মে মার্ক্সীয় ভাবধারাকে সমুন্নত রাখার জন্য তিনি ছিলেন সরব কবি। এই কবি প্রভাবিত হয়েছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ, প্রগতিশীল সংস্কৃতি ও চিন্তার প্রবাহ দ্বারা। ভাষা-আন্দোলনে কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন এবং শহিদ মিনার নিয়ে তিনি প্রথম কবিতা লিখেছেন। ফেব্রুয়ারিকেন্দ্রিক কবিতা 'স্মৃতির মিনার' চিরকালীন বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। কবিতায় ব্যক্তি এবং সমাজকে দেখার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সমকালীন জীবনের সংকটকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন তাঁর কথামালায়, যার আবেদন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। ভাষা-আন্দোলনকেন্দ্রিক জাগরণের ঢেউ আজাদের চেতনা-মন্দির কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ১৯৫৩ সালে কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারী* সঙ্কলনে কালজয়ী *স্মৃতিস্তম্ভ* কবিতা স্থান পায়। এই কবিতাটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে বাঙালি জাতির মনে ও মননে। এই কবিতাটি যখন তিনি লেখেন, বয়সে তখন তিনি একেবারেই তরুণ। তাঁর সাহিত্য-সাধনার প্রথম দিকের কবিতাটিতে আমরা দেখতে পাই অত্যন্ত তীক্ষ্ম, ধারালো এবং মার্কসবাদে উজ্জীবিত আলাউদ্দিনকে, মতবাদের বাইরেও যিনি তাঁর রচনাকে করে তুলেছেন অনন্যসাধারণ এক একটি হীরের টুকরো। শহিদ মিনারের ওপর এমন চমৎকার কবিতা প্রায় বিরল। পাকিস্তানি

শাসকগোষ্ঠী শহিদ মিনার ভেঙে ফেললে প্রগতিশীল এই কবি লিখেছেন চেতনা-জাগানিয়া কবিতাটি। তাঁর রচিত পংক্তিমালা যেন আমাদের রক্তকণিকার স্পন্দনে উচ্চারিত হয়–

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো! যে ভিৎ কখনো কোনো রাজন্য
পারেনি ভাঙতে...॥[৯]

সীমাহীন প্রভাবসঞ্চারি কবিতা এটি। রক্তঝরা একুশের শৈল্পিক অনুষঙ্গ ছিল শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়ার রঙ– যা একুশ বিষয়ক, এমনকি ভাষা-বিষয়ক কবিতামাত্রেই একাধিক কবির হাতে বিচিত্রভাবে রূপ লাভ করেছে।

স্বদেশ, মাতৃভাষা আর নিজস্ব অনুভূতির নির্জন ঘরে নীরব অবস্থিতির জন্য পরিচিত কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)। যেন কবিতা-রাষ্ট্রের সাবধানী কোনো নিরাপত্তাকর্মী। মাতৃভূমি যখনই কোনো সমাজনৈতিক-রাজনৈতিক সমস্যায় পড়েছে, তখনই তিনি সজাগ অবস্থান নিয়েছেন কবিতাকণ্ঠে। মানুষের স্বাধীনতার স্পৃহাকে তিনি সমীহ করতে জানতেন। সাম্প্রদায়িকতা-স্বৈরাচারবিরোধী নাগরিক-আন্দোলন গড়ার প্রত্যয় আছে তাঁর কবিতায়। আন্দোলনকারী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনাকে তিনি ঘাতকদের জন্য অভিশাপবাণীতে পরিণত করেছেন। বিপন্ন মানবতার পাশে তিনি যেন শক্ত-সামর্থ্যবান-সাহসী সহকর্মী। মায়ের সম্ভ্রম আর মায়ের-বাবার ভাষার, দেশের বহুদিনের লালিত ঐতিহ্য আর অর্জিত ইতিহাসের আলোকসভায় তিনি তৈরি করতে চান সৃজনশীলতার পাটাতন। শুধু কথ্য নয়, লেখ্য এমনকি স্থিতিপ্রাপ্ত, মর্যাদাপ্রাপ্ত নির্মিত ভাষার– বাংলা ভাষার ওপর আঘাত তিনি গ্রাহ্য করতে পারেননি। আজন্ম সাথী মাতৃভাষা কবিকে দিনে দিনে, মুহূর্তে মুহূর্তে যে স্বপ্নের সেতু গড়ে দিয়েছে, তাতে ভর করেই তিনি পাড়ি দিচ্ছেন ক্রমাগত পৃথিবীর বিচিত্র যাত্রাপথ; সেই সেতু দিয়েই দেখা-না-দেখা যাবতীয় আনন্দ ও বিস্ময় দৃষ্টিনন্দন জাহাজ ভরে তাঁর বন্দরে এসে ভিড় করে দিনরাত। রঙিন মাছের আশায় কিংবা নক্সা কাটা কাগজ এবং বোতলের ছিপি ফেলে কোনো রত্নদ্বীপে পাড়ি দেবার বাসনায় কবি ঘুমের বাগানে আহ্বান জানান কোনো পরিচিত কাঠবিড়ালিকে। ফেলে-আসা পাঠশালার স্মৃতিতে অনুভব করেন সবুজ সবুজ স্বপ্নচৈতন্য। ভাষাকে, বর্ণমালাকে শামসুর রাহমান স্থান দেন 'আঁখিতারা'রূপে। ভাষা নিয়ে রাজনীতি; মাতৃভাষা, ভাষা ব্যবহারকারীদের ওপর নির্বিচারে চালানো নির্মমতা; একটি ভাষার সমস্ত গৌরব-ঐতিহ্যে আঘাত হানার হিংস্রতা শামসুর রাহমান দেখেছেন কাছ থেকে। প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে উপলব্ধি করেছেন সে যাতনা। মানুষের স্বাভাবিকবৃত্তি, মৌলিক অধিকার আর সহজভাবে চলতে-থাকা জীবনে আছড়ে-পড়া অনাকাঙ্ক্ষিত অভিঘাত স্পর্শ করেছে কবির কোমল হৃদয়ে; তিনি প্রায়-দিশেহারা হয়েছেন মাতৃভাষার চরম দুর্দশার সময়ে। তাঁর ভাবনার প্রকাশ–

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?
উনিশ শো' বায়ান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।...
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।
('বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা': *নিজ বাসভূমে*) [১০]

কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৮৩৪-২০০১) সারাজীবন খুঁজে বেড়িয়েছেন অধরা কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা। প্রেম আর রোমান্টিকতাকে আশ্রয় করে কবিতাচর্চা আরম্ভ করলেও তিনি পরবর্তীকালে দেশমাতা-নিজভাষা, মাটি-মানুষ আর প্রজন্ম-পরিক্রমার কবি হিসেবে স্থিতি অর্জন করেন। সোনার কাঠি রূপার কাঠি হাতে নিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে তিনি যেন এগিয়ে চলেন কবিতার বিরাট-ব্যাপক প্রান্তরের অভিমুখে। কখনো রঙ কখনো সুর কখনো ছায়া কিংবা শুধু নির্জনতার অবাক-করা চঞ্চলতায় অন্ধকারের গভীর ঘ্রাণের অনুভবের দিকে দৃষ্টি তাঁর। কবিতা তৈরি কিংবা নীরব কবিতাযাপন ওবায়দুল্লাহ'র কাছে কোনো নিছক করুণার ব্যাপার নয়; দেহের তাপ বহন করার মতোই এ এক সান্ত্বনার– দাঁড়ানোর জায়গা যেন। মাত্র সতেরো বছরের, অপরিণত যুবক, ওবায়দুল্লাহ'র অনুভবে ধরা পড়লো উৎপাদনমুখর মাটির দুনিয়ায়, প্রকৃতির সকল প্রসন্নতায়, ফুলের আর ডাঁটার সম্ভাবনার বারতা-বহনের আড়ালে, লুকিয়ে থাকা, নিজভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য নতুন প্রজন্মের অস্থিরতা আর পূর্বপুরুষ-পূর্বমহিলার অমিত হাহাকার। শাসকের কঠিন-অযৌক্তিক– চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তের বিপরীতে এই প্রজন্মের প্রতিবাদ আর অধিকার আদায়ের লড়াই-এ অংশগ্রহণ-সামর্থ্যকে কবি কবিতাকাঁথায় সেলাই করেন এভাবে–

মাগো, ওরা বলে
মুখের ভাষা কেড়ে নেবে।
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।
বলো, মা,
তাই কি হয়?
তাইতো আমার দেরি হচ্ছে।
তোমার জন্যে
কথার ঝুড়ি নিয়ে
তবেই না বাড়ী ফিরবো।[১১]

ওরা (শাসক) বলছে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাবে না বাংলা। আর যারা বাংলায় কথা বলছে, তাদের প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞা– এই অন্যায় সিদ্ধান্তের ফয়সালা না করে, ভাষার সম্ভ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করে, তারা ঘরমুখো হবে না।

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) প্রসন্নতা, অগ্রগমন আর রহস্যময়তার কবি। কেবল কবি বলি কেন তাঁকে; তিনি কবিতাচাষের পাশাপাশি রোপণ করে গেছেন গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধের বীজ ও চারাগাছ। লালন করেছেন কাব্যনাট্যের বৃক্ষরাজি। অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল সাহিত্যসাধনায় সক্রিয় থাকার ব্যাপারটিও কোনো সামান্য ঘটনা নয়। সময়-পরিসরের বিবেচনায় যেমন, তেমনি সৃজন-অবদানের দিক থেকেও সৈয়দ হক সহজ কথায় অসামান্য শিল্প-প্রতিভা। পূর্ব-পাকিস্তান, পূর্ব-বাংলা, বাংলাদেশ– এসব ক্যানভাস ছাড়িয়ে তাঁর সাহিত্যআভা বিশ্বপ্রেক্ষাপটের বিরাট জমিনে বিরাজমান; শিল্পকথক সৈয়দ শামসুল হক যেন বাংলাদেশের এক উঁচু ভবন থেকে উচ্চারণ করেছেন ভাবনা-প্রকাশের সূত্রাবলি, শিল্প-প্রকাশের মর্মবাণী। আর তা নানান তারে ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্বিদিক। দেখা-না-দেখা আর ধরা-না-ধরার সাহিত্যমায়া তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে যেন সেই ঘোরলাগা প্রথম কবিতাপ্রহর

থেকে। কবিতাচর্চায় তাঁর দুরন্ত যাত্রা। সৃজনযাত্রায় তাঁর সাধনা চেতনার গূঢ় মূলে জল, বীজ, শস্য, হাসি আর উপদ্রুত হৃদয়ের বাঁধভাঙা ভক্তির বন্যা। কাব্যনাট্যের সফল নির্মাতা সৈয়দ শামসুল হক তাঁর কবিতায় খুব সহজেই বুলিয়ে দিতে পেরেছেন নাটকের শরীর ও প্রাণ। গঠন-কাঠামো আর পরিবেশন-কৌশল তেমন ভাবনারই স্বাক্ষর বহন করে। আর এতে জটিল বিষয়াদিও তাঁর বর্ণনায় হয়েছে উপভোগ্য এবং সাবলীল। বুর্জোয়া অর্থনীতি, ধনতান্ত্রিক সমাজ-রাজনীতির অহমিকা আর ফলত মানবতার অসহায়তা শিল্পের প্রতিকূল; শিল্পীর চিন্তাভুবন সেই যন্ত্রতন্ত্রের ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি-অন্বেষণায় ব্যাকুল। একুশের চেতনায় সেই প্রথম প্রহরের কালেই সৈয়দ হক লিখেছিলেন–

সভ্যতার মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
শিশুর জন্ম থেকে জরাদেহ ক্ষীণশ্বাস মানবের অবলুপ্তির সীমারেখায়
বলে গেল সেই কথা। সেই কথা বলে গেল অনর্গল–[১২]

বাংলা কবিতার 'জনপ্রিয়তা'র জোয়ার এবং নিরীক্ষাপর্বের কবি হিসেবে শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬) এক উজ্জ্বল অধ্যায়। দেশভাগ-পরবর্তী কবিতার যে পালাবদল, যে অল্প কজন কবি এ ধারায় সৃজনশীলতার প্রমাণ রেখেছেন, শহীদ কাদরী তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবি-প্রতিভা। তাঁর কাব্যভাষা আমাদেরকে স্বতন্ত্র এক ভুবনের সন্ধান দেয় অনায়াসে। উজ্জ্বল বিশ্বনাগরিকতা-বোধ, নিবিড় স্বাদেশিকতা, শব্দ ও উপমা প্রয়োগে অভিনবত্ব তাঁর কবিতার সূত্রমুখ। বাঙালি ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে চরম অস্থিতিশীলতার মধ্যে দিয়ে– রাজনৈতিক অস্থিরতার গতর বেয়ে। শান্তি-স্বস্তি আমাদের কাছে সোনার হরিণ কিংবা চাঁদের অমাবস্যা হয়েই থেকে যায়। শাসকের হাত বদল–শোষকের হাতবদল, সেনাধ্যক্ষের শাসনভার গ্রহণ আর অসহায় জনতার নির্যাতিত হবার ইতিহাস আমাদের পরিচিত প্রসঙ্গ। এ দেশ-মা-মাটি একটু স্বস্তির জন্য, কাঙ্ক্ষিত সুবাতাসের জন্য আর্তচিৎকারে কাতর। সাধারণ জনতা অসহায় নির্বাক দর্শক মাত্র। কিন্তু এমনতরো অব্যবস্থা, অশুভ যাত্রা আর কতদিন চলতে পারে? কবি শহীদ কাদরী রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আর দুঃশাসন থেকে বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন আপন স্বপ্ন-বিভোরতায়। রাজনীতি সচেতনতা শহীদ কাদরীর কবিতায় প্রোথিত। রাজনীতির নৈতিকতা তিনি বোঝেন; জানেন এর নোংরামির নির্মমতা। রাজবন্দী, মন্ত্রীর কালো গাড়ি, মিছিল, আহত মজুরের মুখ, ছত্রভঙ্গ জনতা, কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো সাংবাদিক, দেয়ালের পোস্টার, মাইক্রোফোন, সাঁজোয়া বাহিনী, কারফিউ, ১৪৪ ধারা–এসবই রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির কথকতা; মোড়ক-পোশাক। কল্যাণ-শান্তি আর তন্ত্র-মন্ত্রের পরিবর্তনের আশ্বাস– সব যেন ফাঁকা বুলি, শূন্য বাহবার বহর। একুশ প্রসঙ্গে এই কবির একটি কবিতার কিছু অংশের পাঠ নিচ্ছি–

এই কবিতাটি সরাসরি একুশের কবিতা নয়
কিন্তু যদি বরকত, রফিক, সালাম, জব্বারের অফুরান রক্তের লালে
আমার স্বদেশ ডুবে না যেতো– এই কবিতাটি লেখা হতো না কোনোদিন[১৩]

মূলত ভাষা-আন্দোলন বাঙালি কবিকে যে শৈল্পিক উপাদান দিয়েছে, তার বিবরণ দিয়ে শেষ করা কঠিন কাজ। শুধু এটুকু বলা চলে, একুশ বাংলাদেশের নতুন কবিতার নিউক্লিয়াস।

মুক্তিযুদ্ধঃ কবিতায় শৈল্পিক উচ্চারণ

একাত্তর বাঙালির সবচেয়ে বড়ো অহংকার। সবচেয়ে বড়ো অর্জন। পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ফ্রেমে-বাঁধা সার্টিফিকেট।'এত গৌরবময়, এত বেদনাময় বছর বাঙালির জীবনে আগে কখনো আসেনি। বছরটি ১৯৭১। এই একটি বছরের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব বাংলাদেশকে জানল, চিনল এবং বুঝতে পারল সবুজ-শ্যামল প্রকৃতির কাদামাটির মতো নরম বাঙালি প্রয়োজনে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। কোনো সন্দেহ নেই বাঙালি বর্ষাকালে যেমন কোমল, গ্রীষ্মে তেমনই রুক্ষ ও কঠিন।'[১৪] ১৯৭১ বাঙালির প্রবল আনন্দ-অধিকারের কাল। 'অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পলাশি যুদ্ধের মাধ্যমে এদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ না-ঘটলে বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলের ধারাবাহিকতায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও অংশীদারিত্বমূলক বাঙালির স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল ছিল। যা হোক, '৭১-এ পৌঁছাতে বাঙালিদের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। বাংলাদেশ বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্রচিন্তার লালিত স্বপ্নের সফল পরিণতি।'[১৫]১৯৭১ সালের তাপ ও মমতা ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের কবিতায়। কবিরা এই সময় ও সংগ্রামকে এঁকেছেন পরম শ্রদ্ধায় ও স্নেহে।

বাঙালির ইতিহাসে হাজার বছরের একটি টার্নিং পয়েন্ট হলো ১৯৭১ সাল। আর তার অন্তরালে ছিল মূলত স্বাধীনতার প্রত্যাশা এবং জাতীয় চেতনার প্রতি বিশ্বস্ততা। বিষয়টি প্রবলভাবে রাজনৈতিক হলেও এর একটি সাংস্কৃতিক চরিত্র আছে। বাঙালির সকল সংগ্রামে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সবসময় উপাদান ও প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৭১-ও তার ব্যতিক্রম নয়। শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ও স্তরের মতো কবিতাও সর্বদা সতর্ক থেকেছে প্রহরীর ভূমিকায়। আর দিক-নির্দেশনা এবং ধারাবিবরণীও কবিতার একটি জরুরি দায়িত্ব বলে বারবার প্রমাণিত।

সমকালের এক শক্তিমান কবি নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫-)। তিনি কবিতা দিয়ে আমাদের মনের ভেতরে নিরন্তর নির্মাণ করে চলেছেন ভাবনার অপার বাগান। গুণের কবিতা মানেই বুকের আবেগঘন কথার চমৎকার সংকলন। তাঁর কবিতা অভাবনীয় শব্দসৌন্দর্য আর শ্রুতিমধুরতায় মাখা। তিনি রাজনীতিকে কবিতায় ধারণ করেছেন অধিকারের আলোয়। ১৯৭০ সাল। পূর্ব-পাকিস্তানে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সমস্যা প্রকট। আইয়ুব খানের দৌর্দণ্ড প্রতাপে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল। এদিকে জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভের ফলে 'বাংলাদেশ' ভূখণ্ডে নতুন স্বপ্ন। তরুণেরা নতুন নতুন সম্ভাবনা নিয়ে স্বপ্নের ঘর আর বারান্দা তৈরি করছে। চলছে মিছিল। মিটিং। গোপন বৈঠক। প্রকাশ্য সভা। ওদিকে পাক সরকার পূর্ব-পাকিস্তানের লোকেদের ওপরে চালাচ্ছে জুলুম– মামলা-হামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা। এক সদ্য যুবক হুলিয়া বুকে নিয়ে ঘরছাড়া। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর বাড়ি ফিরছে সে। মফস্বল শহর নেত্রকোণায় তার বাড়ি। ঢাকার রাজনৈতিক কর্মসূচির দিকে তখন সবার চোখ। কী ঘটছে ওদিকে? মুজিব কি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন? সরকার কী চাইছে?– সব সমাধান যেন ঢাকা থেকে আসবে– এই প্রতীক্ষা। এমন এক সময়-পরিসরের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে নির্মলেন্দু গুণ-

এর *হুলিয়া* কবিতার শরীর ও কাঠামো। কবির প্রথম কাব্য *প্রেমাংশুর রক্ত চাই* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৭০)-এর প্রথম কবিতা এটি। 'হুলিয়া' শব্দটির আভিধানিক অর্থ– 'বাহ্যিক শারীরিক বিবরণ; আসামীকে গ্রেফতারের জন্য তার চেহারার বিবরণসহ বিজ্ঞাপন'।[১৬] কাজেই কারো ওপর হুলিয়া মানেই তাকে বাবা-মা-আত্মীয়-পরিজন, চেনাজানা নদী-নালা, গ্রাম-গঞ্জ আর সবুজাভ প্রকৃতির শোভন-স্পর্শ ছেড়ে ছুটতে হতো দূর দূরান্তে– পাছে শত্রুপক্ষ দেখে ফেলে, ধরিয়ে দেয় শত্রুর দোসর শাসকের হাতে। 'হুলিয়া' কবিতায় বর্ণিত দেশপ্রেমিক পলাতক মানুষটি যখন দীর্ঘদিন পরে চেনাজানা মাটি, প্রতিবেশ ও লোকজনের মাঝে ফিরে এলো, একটানা অনুপস্থিতির পর এই যে তার আত্মার আত্মীয়দের সাথে মহামিলন, তারই চমৎকার বহিঃপ্রকাশে সমৃদ্ধ কবিতার শরীর। গুণ কবিতাটি শুরু করেছেন এভাবে–

বারহাট্টায় নেমেই রফিজের স্টলে চা খেয়েছি,
অথচ কী আশ্চর্য, পুনর্বার চিনি দিতে এসেও
রফিজ আমাকে চিনলো না।
দীর্ঘ পাঁচ বছর পর পরিবর্তনহীন গ্রামে ফিরছি আমি।
সেই একই ভাঙাপথ,
একই কালোমাটির আল ধরে গ্রামে ফেরা,
আমি কতদিন পর গ্রামে ফিরছি।[১৭]

হুলিয়া কবিতাটির শেষপ্রান্তে আছে এক বিপ্লবীর বিষণ্নতা, হতাশা আর প্রবল ক্ষোভের ছবি। ব্যর্থতার খানিক গ্লানিও মিশে গেছে ভোঁতা অনুভূতির অন্তরালে। কবিতাটি মানুষের জীবনের গল্পে আঁকা। মানুষের স্বপ্ন-বিভোরতা আর মুক্তির রঙে আঁকা; চিন্তা আর অগ্রগতির রঙে রাঙা যেন প্রতিটি শব্দ। সমাজ-রাষ্ট্র যখন মানুষকে পণ্য করে, তখন মানুষ তার মনুষ্যত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। আর তখনই তার বিরুদ্ধে চলে রাষ্ট্রযন্ত্রের নানান ক্ষমতার প্রয়োগ। স্বপ্ন ও চেতনা বাস্তবায়নের জন্য, মুক্তির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুবার তাগিদে কখনো কখনো বিপ্লবী মানব-সন্তানকে ফেরারি হতে হয়। কারণ এই মানুষটির মাথায় ঝুলছে 'হুলিয়া'। কবিতাটিতে রাজনীতি আছে, রাজনীতির বাঁক ও মোড়ের কথা আছে। সমাজের নিটোল ছবি আছে; আছে মানুষ; নর-নারীর প্রেম; গ্রামের চারপাশে শোঁ শোঁ শব্দে ঘুরে বেড়ানো হাওয়া, টিনের চাল, পুকুরের শান্ত নিবিড় জল, ফুলের বাগান থেকে শুরু করে গরুর গোয়াল, পড়ার ঘরের বারান্দায় নুয়ে পড়া বেলিফুলের গাছ, লাউডুগী। কবিতাটিতে 'গোঁয়ার প্রকৃতি'র উপস্থিতির সাথে রয়েছে জটিল রহস্যের অবস্থানও। প্রতীকি বিবরণে মানুষের 'শেয়ালপনা' বা 'কুকুর-প্রবণতা' তুলে ধরেছেন নির্মলেন্দু।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উৎকণ্ঠাময় মুহূর্তগুলো কবি জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) এদেশের মানুষ, ঐতিহ্য, মর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক মহিমাকে সমুন্নত রাখার প্রত্যয় নিয়ে যত্নে গেঁথেছেন কবিতার কাঠামো। তাঁর সেই সূক্ষ্ম বুনোনির আঁচড়ে বাঙালির হৃদয়-আর্তি প্রকাশ পেয়েছে নানান মাত্রায়। সেই ভয়াল সময়ের চমৎকার ভাষারূপ তাঁর *ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে* (১৯৭২)। এই কাব্যটি একাত্তরের ভয়াবহ দিনগুলো স্মৃতিতে রচিত। এদিক দিয়ে বিচার করলে, বর্তমান গ্রন্থটি জাতীয় দুর্দিনে শিল্পীর সামাজিক ভূমিকার দলিল। সর্বেমোট ১৮টি কবিতা রয়েছে এই সংকলনে। 'সমসাময়িক পরিবেশকে চিত্রিত করার উদ্দেশ্যে রচিত হলেও শিল্প সুলভ

সৌন্দর্যের হানি ঘটেনি।'[১৮] কবিতাগুলো তখনই রাশিয়া, আমেরিকা ও ভারতে প্রেরিত হয়েছিল– বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্ব-মানবতার নিরাবেগ সমর্থন জোগানোর প্রত্যাশায়। এ গ্রন্থের 'কবির নিবেদন' কবিতায় সে অভিপ্রায়ই প্রকাশিত হয়েছে। উজ্জ্বল অবয়বে জাতীয় সংকটে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও মানবিক সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার তাগিদ তিনি অনুভব করেছেন–

বিশ্ববাসীরা শোন,
মোদের কাহিনী শুনিয়া কাঁদিবে নাই কি কোন?
সীমান্ত পার হয়ে যারা গেছে হয়ত বেঁচেছে যবে,
এখানে যাহারা রয়েছি জানিনে কিবা পরিণাম হবে।...
আজিও যাহারা বাঁচিয়া রয়েছি, আছি এই আশ্বাসে,
মানবধর্মী ভাইরা আসিয়া দাঁড়াবে কখনো পাশে।[১৯]

ক্ষমতালোভী হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের বীভৎসতা, হত্যাযজ্ঞ, শহর-গ্রাম, বাড়ি-বিপণীকেন্দ্র ধ্বংসের বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে জসীম উদ্‌দীনের বিদ্রোহী চেতনাজাত কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে। তৎকালীন পাকিস্তানি সামরিক শাসক নিরীহ-অসহায় বাঙালির ওপর যে বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে, তাতে কবি-হৃদয় ভীষণভাবে বেদনাক্লান্ত হয়েছে। আর সে কারণেই বাঙালির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁরও জোরালো সমর্থন ছিলো। বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনার দাবি থেকে যখন রাজনৈতিক স্বাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির মন্ত্রণায় উত্থিত হলো সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক, কবি সেখানেও গৌরব অনুভব করেছেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে ঢাকায় বসে প্রত্যক্ষ জীবনবোধ নিয়ে এ কাব্যের কবিতাগুলো রচিত বলে এগুলোর মধ্যে কবির তৎকালীন বিচিত্র আবেগ জড়িয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যকর্মী এবং সমাজসেবক কবি সুফিয়া কামাল (১৯১১- ১৯৯৯) পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা, রক্ষণশীলতার কঠোর-কঠিন বেড়াজাল আর সামাজিক-সংস্কার ভাঙার চিন্তা শৈশবের পাঠনিবিড় পরিবেশেই আত্মস্থ করেছিলেন। রাষ্ট্রচিন্তক সুফিয়া কামালের ভাবনা-পরিসর মানবকল্যাণের মহাপথে প্রসারিত। মসৃণ ও নিরাপদ ভবিষ্যত নির্মাণের জন্য তিনি আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতাবোধ আর উপলব্ধির প্রখরতা তাঁর শিল্প-নির্মাণে সহায়ক শক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল। রবীন্দ্র-নজরুল যুগের এই নরমকণ্ঠ কবি তিরিশোত্তর কাব্যধারায় কবিতাচর্চা না করেও আপন আসন স্থিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন সৃজনশীলতা আর চিন্তা-সামর্থ্যের জোরে। সমাজ-সম্পৃক্ততা তাঁর চরিত্রের বড়ো বৈশিষ্ট্য। কবি ছাড়াও তিনি ছিলেন সমকালের প্রশংসনীয় সমাজ-সংস্কারক। সুফিয়া কামাল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদদেরকে দেখেছেন 'মৃত্যুঞ্জয়' হিসেবে। তাঁর বিশ্বাস, সারা দুনিয়ার মানুষ এই বীর সৈনিকদের বিস্ময়ভরা চোখে দেখবে। শহিদ সন্তানদেরকে তিনি আহ্বান করেছেন 'সোনারা আমার' বলে প্রবল স্নেহভরা ডাকে। শহিদদের জন্য তাঁর পঙক্তিমালা–

ন'মাস কেটেছে এ দেশের মাটি তাজা তাজা খুনে সিক্ত হয়ে,
উর্বর হয়ে এসেছে লয়ে
মৌসুমী ফুল ধানের গন্ধ মিঠা সোনা রোদ বাংলাদেশে–
যাদুরা আমার সেই আবেশে
ঘুমায়ে পড়েছে আহা! ক্লান্তিতে। থাক্, ভাঙ্গাবো না ওদের ঘুম।

মাটির উপরে রাখিয়া চুম
দিলাম তোদেরে।[২০]

চল্লিশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫) সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদক হিসেবে আজও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। কবিতাশিল্পের জন্য তাঁর আকুলতা আর এ পথে পথিক কিংবা সহযাত্রী তৈরিতে তিনি ছিলেন অফুরান অনুপ্রেরণার উৎস। শিল্পকর্মে রুচিশীলতার লালনকর্তা-প্রশ্রয়দানকারী হিসেবেও তাঁর মর্যাদা ঈর্ষণীয়। লোভ আর অস্থিরতা-প্রবণতাকে তিনি শিল্পের প্রতিকূল শক্তি বলে জানতেন; মানতেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচিন্তা আর ইতিহাসজ্ঞানকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন নির্বিকারচিত্তে। স্নায়ুবিভ্রান্তির সর্পিল দিনের যাত্রাপথে কবি হাবীব ইতিহাসের আলো দেখেছেন; ইতিহাসের খেরোখাতার পাতায় পাতায় অনাগত বিস্তার আর বিকাশের আহ্বান শুনেছেন। বিশ শতকের সমাজ আর রাষ্ট্রগতিকে বাঙালির চিরচেনা স্বজন এই কবি অবলোকন করেছেন; অনুধাবন করেছেন। তাঁর কবিতায় স্বাধীন বাংলাদেশে ব্যক্তির আত্ম-পরিচয়ের বিরল বিবরণ মেলে–

শব্দের মালায় আমি তোমাকে গাঁথতে চাই– স্বাধীনতা। তুমি
ঘরে-বাইরে এমন উলঝলুল নৃত্যে মেতে আছো, কি আশ্চর্য
আমার কলম
কিছুতেই তোমাকে যে ছুঁতেও পারে না। আমি
লাল নীল সবুজ সমস্ত রঙ নিয়ে
তোমাকেই সারা বুকে আঁকতে চাই, দেখি...
বুকের মধ্যে
তুমি
মনোহর শব্দমালা।[২১]

কবি আহসান হাবীবের এই অবস্থান প্রসঙ্গ ও আত্ম-পরিক্রমায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে প্রত্যয়, তা আমাদের নিজস্ব শক্তি। এই শক্তিই শিল্পকে, সাহিত্যকে বারবার স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত করে।

পরাধীনতার যাতনা আর যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতের ছবি এঁকেছেন চল্লিশের দশকের প্রথম কবি আবুল হোসেনে (জন্ম: ১৫ আগস্ট ১৯২২; মৃত্যু : ২৯ জুন ২০১৪) পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসনে অতীষ্ঠ পূর্ব-বাংলার মানুষের যে বিপন্নতা, তার রূপ ও রূপান্তর-আভাসের কথামালা নির্মাণ করেন '*নব-বসন্ত*' (১৯৪০)-এর এই কবি–

নির্ঘুম ঢাকার জেলে আমরা যখন অবরুদ্ধ,
মুখ বন্ধ, দম আটকানো, এক শুভার্থীর ফোনে
শুনি ওরা আমার পিতাকে হত্যা করেছে দেশের
এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে, নিরিবিলি নিঝুম শহরে।...
আব্বা বুঝি সেই শোকে দুঃখে রাগে সে অপরাধের
প্রতিবাদ জানিয়ে গেলেন তাঁর নিজের ধরনে
নিঃশব্দে আপন প্রাণ দিয়ে। শুধু যাবার সময়
ওদের গেলেন বলে তর্জনীর অব্যর্থ ভাষায় :
'আমি দেখে গেলাম না সূর্যোদয়, দেখবে ছেলেরা।'[২২]

কবি শামসুর রাহমান আলোকিত মানবসভ্যতা বিনির্মাণ আর আধুনিকতার প্লাটফরমে শিল্পচর্চার বিষয়টি লালন করেছেন তিনি আমৃত্যু। পরাধীনতার-শোষণের গ্লানিমোচনের যে মানবিক আকাঙ্ক্ষা তিনি বর্ণনা করেছেন, তা একজন কথাকারিগরের আপন-অভিব্যক্তিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বাধীনতার জন্য আকুল অপেক্ষা, প্রজন্মপ্রহর আর অর্থনৈতিক স্থিতি-অস্থিতির কালযাপনের ক্লান্তি শামসুর রাহমান অনুভব করেন 'শূন্য থালা হাতে' 'পথের ধারে' বসে-থাকা 'হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী'র উপলব্ধির গাঢ়তায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে লেখা কবিতায় কবি বাঙালি জাতির মনন-চেতনাকে এঁকেছেন এভাবে–

তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী ব'লে যে নৌকা চালায় উদ্দাম ঝড়ে
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিক্‌শাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে-জঙ্গলে ঘুরে-বেড়ানো
সেই তেজী তরুণ যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবী জন্ম হ'তে চলেছে–
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।[২৩]

আল মাহমুদ (১৯৩৬–) কাব্যরচনায় কল্পনা আর বাস্তবজীবনকে বিবেচনায় রেখেছেন সচেতনভাবে। কবিতাচর্চায় তাঁর পরিণতি অর্জনও বেশ দ্রুত। তিনি সমকালের এক প্রবল সতর্ক কবি। বাংলা কবিতায়, খুব অল্প সময়ে, পাঠকের কাছে যাঁরা নিজের ভাষাভঙ্গিকে পরিচিত করতে পেরেছেন, তাঁদের সারিতে আল মাহমুদ একটি আলোচিত নাম। লোকজ উপাদান প্রয়োগ, জীবন-যন্ত্রণা রূপায়ণের পাশাপাশি তিনি সমকালীন রাজনৈতিক প্রসঙ্গেও কবিতাচিন্তাকে রেখেছেন সর্বদা প্রসারিত। ১৯৭১ সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার একটা চমৎকার বিবরণ মেলে 'বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার' কবিতায়। এখানে তিনি যুদ্ধকালীন বাস্তবতা এবং এর আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিকতাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন–

১৯৭১ সাল।
আমি পালিয়ে এসেছি আমার দেশ থেকে।
আমার স্ত্রী কোথায় আমি জানি না। আমার বন্ধুরা
আছে কি নেই বেতারে সেই উদ্বেগ উচ্চারিত হচ্ছে।
বুদ্ধদেব, আপনার মুখদর্শনের জন্য আমি এক বিদেশী
কূটনীতিকের
ভোজসভায় অনাহূত বেহায়ার মত ঢুকে গিয়েছিলাম!
যদিও মেজবান দম্পতি আমাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন,
বললেন, কবির জন্য এ দ্বার সর্বদা অবারিত। তবুও
আমি অভ্যাগতদের চোখের দিকে তাকাতে পারছি না।
প্রত্যেকের চোখে চোখে দাবার ঘুটি চালাচালি হচ্ছে।
আমার হাতে বীয়ারের গ্লাস কাঁপছে। এক মার্কিন

নাট্যামোদী ভদ্রলোক কানের কাছে মুখ এনে বললেন,
তোমাদের ছেলেরা ভালোই লড়ছে, জিত হবে। ভেবো না।'[২৪]

রফিক আজাদ (১৯৪২–২০১৬) ভালোবাসা-ঘৃণা ও প্রতিবাদ, সৌন্দর্যচেতনা এবং লুকায়িত চৈতন্য জাগিয়ে তুলতে কবিতাকে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো দার্শনিকতা ছাড়াও কেবল কথার চাতুর্য নিয়ে যারা কবিতার দরোজায় কড়া নাড়েন, তাদের মধ্যে কবি রফিক আজাদ অন্যতম। নন-পোশাকি ফরমেটে কবিতা লিখেছেন রফিক। ঔদ্ধত্যপূর্ণ উচ্চারণ রফিক আজাদের কবিতার একটি স্বাভাবিক স্বর। সমকালে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টিকারি 'ভাত দে হারামজাদা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে মানুষের পেট ও মনের যাতনা মোচনের বিকট উচ্চারণের স্বপক্ষে। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে সহসা দুর্ভিক্ষের শিকার হাজার হাজার মানুষের দিশেহারা মনের আকুতির প্রতিচ্ছবি এই কবিতা–

আমার সামান্য দাবি : পুড়ে যাচ্ছে পেটের প্রান্তর–
ভাত চাই– এই চাওয়া সরাসরি– ঠাণ্ডা বা গরম,
সরু বা দারুণ মোটা রেশনের লাল চাল হ'লে
কোনো ক্ষতি নেই– মাটির শানকি-ভর্তি ভাত চাই :
দু'বেলা দু'মুঠো হ'লে ছেড়ে দেবো অন্যসব দাবি।...

ভাত দে হারামজাদা, তা না হ'লে মানচিত্র খাবো।'[২৫]

ব্যক্তির পরাজয় থেকে রাষ্টভূমির ক্রমপতনের আখ্যান বর্ণনা করতে গিয়ে রফিক আজাদ নির্মাণ করেছেন স্বাধীনতার স্বাদ ও স্বস্তির বিপরীতে বিপুল বিপন্নতা। মূলত শিল্প-শুভবোধ আর মানবিক মূল্যবোধই যে কবিতার আরাধ্য, স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে রফিক সে কথাই তাঁর পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭–২০০৪) রাজনীতি সচেতন কবি। রঙিন চশমায় দেখা রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল প্রখর। সুবিধাবাদের প্রতিকূলে তাঁর ভাবনার স্রোত প্রবাহিত। তিনি নিয়ত শান্ত রাজনীতি-প্রবণ রাজ্য আর জীবনব্যবস্থা প্রবর্তন করার পক্ষে; রঙে রঙে সাজাতে চেয়েছেন মানুষের জীবনের অলি-গলি। বহুমাত্রিক-প্রথাবিরোধী লেখক হুমায়ুন আজাদ বিশেষত পরিচিতি ও খ্যাতি অর্জন করেছেন প্রাবন্ধিক-ভাষাবিজ্ঞানি-ঔপন্যাসিক হিসেবে। তবে কবিতাচর্চায়ও রয়েছে তাঁর ব্যাপক সাফল্য। চলমান সমাজ পরিপ্রেক্ষিত, রাষ্ট্রনীতি, সভ্যতার বিবর্তন, মূল্যবোধের ব্যাপক বিকৃতি, মানব-প্রবৃত্তির রূপায়ণ আর ভাবনার উদার-সরল প্রকাশভঙ্গি; তাঁর কবিতানির্মিতির ভেতর-কথা। বাঙালি এক রকম পঙ্গুত্বকে বরণ করে নিয়েছে বলে মনে করতেন তিনি। সেই উপলব্ধি মনে লালন করে আটপ্রহর যাতনা অনুভব করেন যে হুমায়ুন আজাদ, তিনি সরষে খেতের হলুদ বন্যার মধ্যে এক বিকেলবেলায় সামান্য ভালোলাগার যে অনুভব সন্ধ্যে আসার আগেই বয়ে এনেছিল বিরোধের বিষ, তার বিভ্রম থেকে বেরুতে না-পারার কাতরতায় কাতরাতে কাতরাতে আবর্জনা-অর্থনীতি-পরিচ্ছদ-রক্তনালিতে রঙের গহনপোচ সাজিয়ে তোলেন। জলপাই-এর স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে না চাইলেও হুমায়ুন চান পৃথিবী থেকে জলপাই রঙের পোশাক বিদূরিত হোক; কেননা দুনিয়ায় তিনি প্রত্যাশা করেন রঙিন বেহেশত। রঙচটা শালিখের

পিছে ছুটে আর কতোদিন পথ-চলা যায়! রঙধনুর আসা-যাওয়া কিংবা চাঁদের রঙকে স্থায়ীভাবে ধরতে চান তিনি। সবুজ ঝোপের নিচে পড়ে-থাকা টকটকে লাল ফুলে দেখতে চান নিজের ঠোঁট থেকে খসে পড়া রক্তিম চুম্বন। ভালোলাগার রঙ লাগিয়ে চারদিক রঙিন পাপড়িতে ছড়িয়ে দেবার বাসনা বুকে নিয়ে কবি সাজান কথামালা। বাংলাদেশের জমিতে প্রতিনিয়ত জমা হচ্ছে পথিকের রক্ত; বীজ বুনতে-থাকা কৃষক, শিশু, শিক্ষার্থী, যুবক, রিক্সাওয়ালা আর পদ্মানদীর মাঝির অপার নিসর্গে উগড়ে ফেলে রক্তকণা। সাদা বোতলে রাখা লাল রক্ত ঘোলা হতে থাকে দিন দিন; বাড়তে থাকে বেদনার ভার। নারীর কপালে লাল টিপ আর অ্যাকোরিয়ামে পোষা লাল মাছ কিংবা বাধা সৃষ্টিকারী সড়কের মাঝে মাঝে দুলতে-থাকা লাল সিগন্যাল যেন খাবলে খায় গতরের লাল মাংস; সবদিকে সর্বনাশী লাল ভয়ংকর কোলাহলে কোমরে সোনালি সাপ লাল মাছ পদ্মার ইলিশ, নিবিড় মৌমাছিপুঞ্জ গড়ে মৌচাক। এদেশের প্রান্তে প্রান্তে, ফসলের খোলা মাঠে, কোটি মানুষের স্বপ্নের সংসারে প্রসারিত দুটি শীর্ণ লাল নিজবাহু দুচোখে অপলক দেখেন কবি; ভাবেন প্রসন্ন প্রহর আর কতোদূর?–

আমার দু-বাহু শীর্ণ তবু কারো কারো কাছে সোনালি সুন্দর
তারা আসে আসবেই
তারা গলে গলবেই
ছড়িয়ে দিয়েছি দুই শীর্ণ জীর্ণ লাল বাহু
রাজপথ কানাগলি ভাঙাচোরা রাস্তায়
ধরা দাও ধরা দাও যাদের বুকের মধ্যে
গাঢ় লাল পতাকা উড়ছে।[২৬]

কবি আবুল হাসান (১৯৪৭– ১৯৭৫) প্রতিভার শক্তি আর আলোকে নির্মাণ করেছেন আত্ম-পরিভ্রমণের বর্ণনলিপি। জীবন সম্বন্ধে, বিশেষত নিজের জীবন সম্বন্ধে শৈল্পিক নিয়তির অনুভব, আত্মচিহ্নায়নের বিকাশ, শাশ্বত সামষ্টিক সম্পর্কসূত্র-অন্বেষা আর মগ্নচৈতন্যের অভিকেন্দ্রিকতাকে আবিষ্কারের মধ্যেই আবুল হাসানের কবিতা-সৃজন-বেদনা আলোর পথে রাখে পদচিহ্ন। প্রথম থেকেই তাঁর কবিতায় দার্শনিকতার নিবিড় স্থাপনা পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি হয়ে ওঠেন আত্ম-বিবরণের কবি। ক্রমাগত এগোতে থাকেন নিজের ভেতরকে প্রকাশ করার আর পারিপার্শ্বকে নিজ-পরিচয়ে তুলে আনার আপ্রাণ প্রচেষ্টায়। আবুল হাসান দেখেছেন, প্রকৃতঅর্থে, আমরা ভালো থাকি না; ভান করি মাত্র। অন্ধকারে আলো কুড়াতে-থাকা মগ্ন মানুষ কি সত্যিই বলতে পারে– সে ভালো আছে? না, পারে না। সভ্যতার অগ্রগমণে মানুষের পায়ের আওয়াজ আর পানিপতনের শব্দে সৃজনশীল ব্যক্তি সঞ্চয় করেন সবুজাভ শক্তি। বেদনা আর ভবালাবাসার ভাষা খুঁজতে-থাকা কবি হাসান যেন অজান্তে বুকের ভেতর গড়ে তোলেন অক্ষরভরা উপন্যাসের জরা-পাহাড়। এক সময় তাঁর কণ্ঠ শোককাতর হয়ে ওঠে। তিনি স্বাধীনতার পতাকায় দেখতে থাকেন চেনা মানুষের মুখ, মুখের প্রতীক– আপনজন হারানোর যন্ত্রণা-আভাস–

লক্ষী বউটিকে
আমি আজ আর কোথাও দেখি না,
হাঁটি হাঁটি শিশুটিকে

কোথাও দেখি না; ...
কেবল পতাকা দেখি,
কেবল উৎসব দেখি,
স্বাধীনতা দেখি,
তবে কি আমার ভাই আজ
ঐ স্বাধীন পতাকা?
তবে কি আমার বোন, তিমিরের বেদীতে উৎসব?[২৭]

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে পাওয়া-না-পাওয়ার হিসাব সব সময় মিলেছে, তা কিন্তু নয়। প্রাপ্তির আনন্দের পাশাপাশি হতাশা আর বিষণ্নতাও আঁকড়ে ধরেছিল মানুষের জীবন। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাওয়া নতুন দেশে স্বাধীনতার স্বাদ খুব একটা সুখস্পর্শময় ছিল না। সেই অনুভব পাওয়া যায় এক কবির বিবরণে–

বাঁচতে চেয়ে খুন হয়েছি বুলেট শুধু খেলাম
উঠতে এবং বসতে ঠুঁকি দাদার পায়ে সেলাম,
ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না বলা যাবে না কথা
রক্ত দিয়ে পেলাম শালার আজব স্বাধীনতা![২৮]

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬–১৯৯১) রাজনীতি সচেতন কবি। কবিতার সঙ্গে রাজনীতির সংশ্লিষ্টতা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং স্বীকৃত; দেশ-কালের সংকটে কবিরা সর্বদাই সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ থাকেন। এদেশে রাজনৈতিক সংকট মানবতাকে বিপর্যস্ত করেছে বারবার। আর তাই সচেতন কবিকেও থাকতে হয়েছে সদা সতর্ক। সত্তরের কবিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে রুদ্রের কবিতাই সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয় কবিতামঞ্চে, পাঠকের কণ্ঠে। রুদ্রর বিশেষত্ব এখানে যে, তিনি খুব দ্রুত জনতার কবি হয়ে উঠতে পেরেছেন। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, নষ্টামি আর যাবতীয় প্রতারণা-প্রবণতার বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা ছিল খুব সক্রিয়। কবি একাত্তরের স্বাধীনতার স্বাদ ও মর্যাদাকে বিপর্যস্ত হতে দেখেছেন। সেই পুরনো শকুনেরা পুনরায় জাতিসত্তাকে খামছে ছিড়ে ফেলতে শুরু করেছে– তা তিনি অনুভব করেন প্রাতিস্বিক-বোধে। তাই রুদ্র লেখেন–

আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই,
আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ন নৃত্য দেখি,
ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে–...
স্বাধীনতা– সে আমার স্বজন হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন,
স্বাধীনতা– সে আমার প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল।
ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা।[২৯]

কবির এ বোধ বাঙালি জাতিকে এক প্রবল প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। বাঙালি কি তবে হারাতে বসেছে তার গৌরবের ঐতিহ্য-শক্তির দৃঢ়তা, প্রতিবাদের শক্তি শুধু কবিতা দিয়ে, কবিতা লিখে সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা সম্পন্ন করা যায় না। প্রয়োজন ব্যক্তিক সক্রিয়তাও। রুদ্র তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। আর তাই পঁচাত্তর-পরবর্তী এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাকে তৎপর থাকতে দেখা যায়। মিছিলে, কবিতার মঞ্চে রুদ্রের সক্রিয় ও সুদৃঢ় যাতায়াত ছিল। কবিতা এবং রাজনৈতিক-ভাবনা সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা

বিবেচনা করেও বলা যায়, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ এ দুয়ের এক চমৎকার সমন্বয় ও সহাবস্থান তৈরির প্রত্যয়ে স্থিতধী কবি। আবৃত্তি-যোগ্যতা রুদ্রের কবিতার অনন্য বৈশিষ্ট্য। দ্রোহ ও সংগ্রামের প্রতি অনড় বিশ্বাস আর শিল্পিত চর্চা তাঁর কবিতাকে দিয়েছে অনন্য মহিমা এবং স্বাতন্ত্র্য।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আরও অনেকে কবিতা লিখেছেন। ভবিষ্যতেও যে এই ঘটনা কবিতার প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ হয়ে থাকবে, তা কিছু-না-ভেবেও বলা যায়। বাংলা কবিতার জন্যে ১৯৭১ এক অনিবার্য উপাদান।

শেষকথা

ভাষা-আন্দোলন বাংলাদেশের কবিতার এক অনন্য উপাদান। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ, ১৯১১-এর বঙ্গভঙ্গ রদ প্রভৃতি ঘটনার ধারাবাহিকতায় ভাষা-সংস্কৃতির এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রহর ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন। বিশেষ করে দেশভাগ-পরবর্তী ঢাকা-কেন্দ্রিক কবিতার নতুন প্রেরণা ও শক্তি এই সংগ্রাম। আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাংলা কবিতার জন্যে বয়ে এনেছে পরিণতির প্রলেপ। কবিতায় স্বাধীনতা কিংবা স্বাধীনতার কবিতা যেভাবেই বলি না কেন, শিল্পিত উচ্চারণে ও বর্ণিল শোভায় বাংলাদেশের কবিতা আমাদের ঐতিহ্যকে ধারণ করে নিপুণ শক্তিতে। ১৯৫২ ও ১৯৭১ সালের যে মহিমা, কালের পরিক্রমায়, তার সামর্থ্য ও সৌন্দর্যকে কবিরা অনুভব করেছেন আপন আপন বোধে ও প্রতিভার আলোয়।

তথ্যসূচি:

---

১ কাজী নজরুল ইসলাম,*নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, নতুন সংস্করণের প্রথম পুনর্মুদ্রণ মে ১৯৯৬), পৃ. ৭

২ https://kobitacocktail.wordpress.com/২০১৪/০৬/১০/কাস্তে-কবি-দিনেশ-দাস/
[কবি দীনেশ দাস (জন্ম : ৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৩; মৃত্যু : ১৩ মার্চ ১৯৮৫) এক আবর্তসংকুল সময়খণ্ডের উল্লেখযোগ্য কবি। তখন ছিল বাংলার এক দুঃস্বপ্নের সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শত্রুপক্ষ একেবারে সদর দরোজায় এসে হানা দিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে (পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত) কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। তারপর ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এবং স্বাধীনতা ও দেশ-বিভাজনের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়ে। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সাড়া জাগানো 'কাস্তে' কবিতাটি। এটি আধুনিক বাংলা কবিতার এক মাইলফলক হিসেবে আজও চিহ্নিত হয়ে আছে। এটি প্রকাশের পর তিনি প্রায় রাতারাতি মেহনতী মানুষের জীবন-যন্ত্রণা প্রকাশের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। 'কাস্তে' কবিতায় শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদকে তিনি শ্রমজীবী কৃষকের ফসল কাটার ক্ষুরধার অস্ত্র কাস্তের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে চাঁদ এতোকাল কাব্যজগতে প্রেম ও সৌন্দর্যের লাবণ্যময় প্রতীক ছিল, তাকে তিনি খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার করে তুললেন। এই বৈপ্লবিক চিন্তাটি সমকালে এবং উত্তরকালে কবিদের প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। বায়ান্নো ও একাত্তর বিষয়ক কবিতায়ও আমরা পাবো এই চেতনার প্রবাহ।]

৩ জুলফিকার মতিন, *কবিতার দেশ*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জুলাই ১৯৯৬), পৃ. ৬৪

[৪] হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি*, (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫), পৃ. ৩৮

[৫] আলী আশরাফ, 'সকল ভাষার মর্যাদা সমান', *একুশে ফেব্রুয়ারী*, সম্পাদনা : হাসান হাফিজুর রহমান, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৫৩, (ঢাকা : সময় প্রকাশন, সময় প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০১), পৃ. ২৫

[৬] সাঈদ-উর-রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩), পৃ. ২৮৬

[৭] বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা-আন্দোলনের প্রতিফলন', *ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য*, ফজলুল হক সৈকত সম্পাদিত, (ঢাকা : ভাষাপ্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ৫৯

[৮] https://bn.wikipedia.org/wiki/কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি

[৯] আলাউদ্দিন আল আজাদ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, (ঢাকা : গতিধারা, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০০১), পৃ. ২৮-২৯। (কবিতাটির রচনাকাল : ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। স্থান : ইকবাল হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।)

[১০] শামসুর রাহমান, *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৩), পৃ. ৬৭

[১১] আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, 'মাগো, ওরা বলে', *কবিতাসমগ্র*, (ঢাকা : অনন্যা, জানুয়ারি ১৯৯৯), পৃ. ৩০।

[১২] *একুশে ফেব্রুয়ারী*, সম্পাদনা : হাসান হাফিজুর রহমান, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৫৩, (ঢাকা : সময় প্রকাশন, সময় প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০১), পৃ. ৪৭

[১৩] শহীদ কাদরী, 'একে বলতে পারো একুশের কবিতা', *আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও*, (ঢাকা : অবসর, ফেব্রুয়ারি ২০০৯), পৃ. ১৯-২০

[১৪] রশীদ হায়দার, 'সবিনয় নিবেদন' *একাত্তরের চিঠি*, সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি সালাউদ্দীন আহমদ, (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন প্রথম সংস্করণ মার্চ ২০০৯), পৃ. ৫

[১৫] হারুন-অর-রশিদ, '*আমাদের বাঁচার দাবী*' : *৬ দফা'র ৫০ বছর*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০১৬), পৃ. ৭৪

[১৬] *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, পরিমার্জিত সংস্করণ পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০৩), পৃ. ১২১৩

[১৭] নির্মলেন্দু গুণ, *কাব্যসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ১৯৯২), পৃ. ১৯।

[১৮] এ.কে.এম. আমিনুল ইসলাম, *জসীম উদ্‌দীন : কবি ও কাব্য*, (ঢাকা : সিটি পাবলিশার্স, সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১), পৃ. ১৬৭

[১৯] জসীম উদ্‌দীন, *ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে*, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)।– এ গ্রন্থের কবিতাগুলো ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে জুলাই মাস সময়কালে রচিত এবং বেশিরভাগ কবিতাই 'তুজম্বর আলি' ছদ্মনামে দেশের বাইরে প্রচারিত। মাত্র দু'টি কবিতা– 'বঙ্গবন্ধু' ও 'ধামরাই রথ' একাত্তরেই এদেশে বেতারে কবি পাঠ করেছিলেন। তাঁর এই ছদ্মনাম ধারণ নিয়ে হয়তো বিতর্ক কিংবা প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রশ্ন উঠতে পারে কবি জসীম উদ্‌দীনের নির্ভীকতা নিয়েও। তবে সময়ের দাবি এবং জাতীয় সংকটে তাঁর সচেতন মানসকে বিবেচনায় রাখলে এসব সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্ভবত হালকা হয়ে পড়বে।

[২০] সুফিয়া কামাল, 'মোর যাদুদের সমাধী 'পরে', *স্বনির্বাচিত কবিতা*, (ঢাকা : সময় প্রকাশন, সময় প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০১), পৃ. ১৫০

[২১] আহসান হাবীব, *আহসান হাবীব রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আহমদ রফিক সম্পাদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, এপ্রিল ১৯৯৫), পৃ. ২৩০-২৩১

[২২] আবুল হোসেন, *কবিতা সংগ্রহ*, (ঢাকা : গতিধারা, অক্টোবর ২০০০), পৃ. ২২৩

[২৩] শামসুর রাহমান, *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৩), পৃ. ৮০

[২৪] আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র*, (ঢাকা : অনন্যা, দ্বিতীয় প্রকাশ : বইমেলা ২০০০), পৃ. ১৩৫।

[২৫] রফিক আজাদ, *কবিতাসমগ্র*, (ঢাকা : অনন্যা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭), পৃ.

১০৩-১০৪। (*সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে; তবে সংকলিত কবিতাগুলোর রচনাকাল: ১৯৭২-১৯৭৩ সময়-পরিসরে।)

২৬ হুমায়ুন আজাদ, *কাব্যসমগ্র*, (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৫), পৃ. ৪৫

২৭ আবুল হাসান, 'উচ্চারণগুলি শোকের', *আবুল হাসান রচনাসমগ্র*, (ঢাকা : বিদ্যা প্রকাশ, দ্বিতীয় প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮), পৃ. ৩১-৩২

২৮ http://www.sachalayatan.com/shubinoymustofi/8133
[ষাট ও সত্তরের দশকের জনপ্রিয় সাংবাদিক ও ছড়াকার আবু সালেহ (জন্ম : ২২ জুলাই ১৯৪৮) *পল্টনের ছড়া* বলে একটা বই ছাপিয়েছিলেন, তাতে রাজপথের ছড়া, বিক্ষোভের ছড়া। ছড়াগুলা তিনি লিখেছিলেন ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে ১৯৭৪ সালের মধ্যে।]

২৯ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, *রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : বিদ্যা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২), পৃ. ১০। [*উপদ্রুত উপকূল* গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯-তে। প্রকাশক : আহমদ ছফা]